ধান গবেষণা সমাচার

ষোড়শ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা | আষাঢ়-কার্তিক ১৪১২ | জুলাই-অক্টোবর ২০০৫

ব্রি-র মহাপরিচালকের দায়িত্বের মেয়াদ বৃদ্ধি

দেশের বিশিষ্ট উদ্ভিদ প্রজননবিদ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এম মহিউল হকের দায়িত্বের মেয়াদ ২ জুলাই ২০০৫ থেকে পরবর্তী এক বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ থেকে ব্রি-র মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি ব্রি-র পরিচালক (প্রশাসন) পদে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৩ সালে ব্রি-তে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করে ড. হক গত ৩২ বছর ব্রি-র বিভিন্ন পদে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর যোগদানের পর থেকে এ পর্যন্ত ব্রি যে ৪৫টি উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে তার গবেষণা কাজের সাথে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে দেশের খাদ্য শস্য উৎপাদনে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

১৯৪৮ সালে তিনি ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার হামিরদি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৯৬৯ সালে বিএসসি (অনার্স), ১৯৭০ সালে এমএসসি ডিগ্রি এবং ইউনিভার্সিটি অব ফিলিপাইনস থেকে ১৯৭৫ সালে এমএস ও ১৯৮৯ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। দেশী এবং বিদেশী জার্নালে তাঁর ১৮টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তিনি একটি গ্রন্থেরও রচয়িতা।

দীর্ঘ কর্মজীবনে কারিগরি বিশেষজ্ঞ অথবা প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে তিনি ফিলিপাইন, ভারত, চীন, থাইল্যান্ড, নেপাল, যুক্তরাজ্য, ভিয়েতনাম, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ সফর করেছেন। ❐

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ব্রি উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্র জনপ্রিয়করণ বিষয়ে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন কর্মশালায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন কৃষি মন্ত্রী এম কে আনোয়ার, এমপি।

আরো দুটি উফশী ধানের জাত উদ্ভাবন

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আরো দুটি উচ্চ ফলনশীল (উফশী) আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। সম্প্রতি জাতীয় বীজ বোর্ডের অবমুক্ত করা এ জাত দুটির মধ্যে ব্রি ধান৪৪ রোপা আমন ও ব্রি ধান৪৫ বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য উপযোগী। ব্রি ধান৪৪ রোপা আমন মৌসুমে বিআর১১-এর মতো চাষ করা যায়।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

আন্তর্জাতিক প্ল্যাক পেয়েছে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কে সম্মান সূচক প্ল্যাক প্রদান করেছে। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান এবং ইরি-র সঙ্গে ব্রি-র তিন দশকের বেশি সময়ের অংশীদারিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এ প্ল্যাক দেয়া হয়।

আন্তর্জাতিক ধান বর্ষ ২০০৪ উপলক্ষে প্রদত্ত এ প্ল্যাক ২৩ মার্চ ২০০৫ ব্রি-র মহাপরিচালক ড. এম মহিউল হকের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন ইরি বাংলাদেশের প্রতিনিধি ড. নোয়েল পি মেগোর। এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ব্রি কৃষি যন্ত্র ব্যবহারে হেক্টরে ৬,৪২০ টাকা সাশ্রয় হয়

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর এক কর্মশালায় বক্তারা জানান, ব্রি কৃষি যন্ত্র ঠিকভাবে ফসলের আগাছা নির্মূল, কাটা, মাড়াই ও ঝাড়াই কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতি মৌসুমে হেক্টরে ৬,৪২০ টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫ ব্রি কৃষি যন্ত্র জনপ্রিয়করণ বিষয়ে এক পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন কর্মশালায় এসব তথ্য জানানো হয়।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রী এম কে আনোয়ার, এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ইব্রাহিম খলিল। কর্মশালায় স্বাগত ভাষণ দেন ব্রি-র মহাপরিচালক ড. এম মহিউল হক। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রি-র পরিচালক (গবেষণা) ড. এম এ বাকী।

কৃষি মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, কৃষি যন্ত্রপাতি জনপ্রিয়করণের জন্য সারা দেশে আরও ব্যাপকভাবে কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এর জন্য তিনি প্রচলিত ধারায় এ কার্যক্রম ২০/২১টি গ্রামে সীমিত না রেখে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কে সম্মানসূচক প্ল্যাক প্রদান করেছে। এ প্ল্যাক ব্রি-র মহাপরিচালক এম মহিউল হকের কাছে হস্তান্তর করেন বাংলাদেশে ইরি প্রতিনিধি ড. নোয়েল পি মেগোর। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে সাবেক ইরি প্রতিনিধি ড. এস আই ভূইয়া ও ইরি-র লিয়াজোঁ বিজ্ঞানী ড. এম এ হামিদ মিয়া।

আন্তর্জাতিক প্ল্যাক

১ম পৃষ্ঠার পর

এ উপলক্ষে ব্রি সদর দপ্তরের ভিআইপি কনফারেন্স রুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. এম মহিউল হক। আলোচনায় অংশ নেন ইরি-র সাবেক বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. এস আই ভুঁইয়া ও ইরি-র লিয়াজো বিজ্ঞানী ড. এম এ হামিদ মিয়া। অনুষ্ঠানে ব্রি-র তৎকালীন পরিচালক (প্রশাসন) ড. এম এ বাকী, তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (গবেষণা) ড. নাজিরা কোরাইশী কামাল, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা সমন্বয়কারী ড. বি এ এ মুস্তাফি, ব্রি-র বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ❐

আরো দুটি উফশী

১ম পৃষ্ঠার পর

এ জাতটি বৃহত্তর বরিশাল জেলার অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা এলাকায় চাষাবাদের জন্য উপযোগী। তবে জোয়ারের সীমা সর্বোচ্চ ৬০ সেন্টিমিটারের বেশি নয়। এ পরিবেশে ব্রি ধান৪৪-এর ফলন হেক্টরে গড়ে সাড়ে ৪ টন যা বিআর১১-এর থেকে হেক্টরে এক টনের বেশি। ওই এলাকার আয়তন ০.৮ মিলিয়ন হেক্টর।

ব্রি ধান৪৫-এর ফলন হেক্টরে সাড়ে ৫ টন যা বোরো মৌসুমের জনপ্রিয় জাত ব্রি ধান২৮-এর চেয়ে হেক্টরে ০.৫ টনের বেশি। এর কাণ্ড বেশ শক্ত বলে ঝড়ো বাতাসে ঢলে পড়ে না। এ ছাড়া ব্রি ধান৪৫-এর জীবনকাল ব্রি ধান২৮-এর সমান।

এ জাত দুটি কৃষকভাইদের দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং দেশের ধান উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন।

এ দুটো জাতসহ ব্রি এ পর্যন্ত মোট ৪৫টি আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। ❐

ব্রি কৃষি যন্ত্র ব্যবহারে

১ম পৃষ্ঠার পর

সারা দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে বিস্তৃত করার তাগিদ দেন। এ জন্য তিনি কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, যান্ত্রিকায়নের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে বীজ, পানি, সার ও শ্রম সাশ্রয় হয়। তাই আগামী দিনে এ দেশের কৃষির বিকাশ ত্বরান্বিত করতে কৃষি যান্ত্রিকায়নের কোন বিকল্প নেই।

মূল প্রবন্ধে ড. বাকী জানান, ব্রি কৃষি যন্ত্র জনপ্রিয়করণ প্রকল্পের আওতায় মাঠ প্রদর্শনীর ফলে এবং ব্রি-র তালিকাভুক্ত প্রস্তুতকারদের সহায়তায় এ পর্যন্ত ৫,৪৭১টি কৃষি যন্ত্র বিভিন্ন সংস্থা ও কৃষকদের মাঝে বিক্রি করা সম্ভব হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার বিশেষজ্ঞ, কৃষি যন্ত্র উৎপাদনকারী ও কৃষকসহ ৫০০ প্রতিনিধি অংশ নেন। ❐

বরিশালে ড্রাম সিডার দিয়ে ধান চাষ বিষয়ে মাঠ দিবস

গত ২৮ জুন ২০০৫ ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশালে ড্রাম সিডার দিয়ে সরাসরি বপন পদ্ধতিতে আউশ ধান চাষাবাদ বিষয়ে এক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এ কার্যালয় প্রধান ড. নিত্য রঞ্জন শর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো: মোখলেছুর রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন ঝালকাঠি জেলার উপ-পরিচালক অখিল ভূষণ ভৌমিক ও বরিশাল জেলার প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা এ টি এম মঞ্জুরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানী, বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত কর্মকর্তা ও কৃষকসহ প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ❐

কুমিল্লার হোমনায় মাঠ-পর্যায়ে ফলন ব্যবধানের পরীক্ষা সম্পন্ন

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা মাঠে এবং দেশের কৃষকদের মাঠে ধানের ফলনের যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। যেমন গবেষণা মাঠে ব্রি ধান২৯ এর ফলন প্রতি হেক্টরে সর্বোচ্চ ৭/৮ টন হলেও চাষী ভাইয়েরা সাধারণত ৪/৫ টনের বেশি ফলন পান না। ফলনের এই পরিমাণগত ব্যবধানের জন্য অনেকে গবেষণা মাঠে ব্রি-র বিজ্ঞানীদের বাড়তি ফলনের দাবির যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এ অবস্থায় কৃষি মন্ত্রী এম কে আনোয়ার, এমপি ব্রি-র বিজ্ঞানীদের প্রতি আহবান জানান তারা যেন কৃষকদের মাঠে ধান চাষ করে তাদের বাড়তি ফলনের দাবির যথার্থতা প্রমাণ করেন। সে অনুযায়ী দেশের আরো কয়েকটি এলাকার মতো কুমিল্লার হোমনা থানার কাচারীকান্দী গ্রামের মাঠে এ পরীক্ষামূলক চাষাবাদ সম্পন্ন হয়।

গত ৭ মে ২০০৫ আনুষ্ঠানিকভাবে কাচারীকান্দি গ্রামের মাঠে ব্রি-র বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে রোপণকৃত ধান কাটা হয়। এ কর্তন অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রী, ইরি, ব্রি, বিএডিসি, ডিএই, জেলা-উপজেলা প্রশাসন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ওই মাঠে ব্রি ধান২৯ ধানের ফলন হয়েছে প্রতি হেক্টরে সাড়ে ৯ টন। তবে সে এলাকার জমিতে সাধারণ কৃষকদের মাঠে একই ধানের ফলন হয়েছে সাড়ে ৬ টন পর্যন্ত। কৃষিমন্ত্রী এ ফলন ব্যবধানের কারণ জানতে চাইলে তাঁকে জানানো হয়, ব্রি-র বিজ্ঞানীরা সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে ধান চাষ করেছেন। তাঁরা বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার করেছেন। মাটির উর্বরতা অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে সুষম সার প্রয়োগ এবং নির্ধারিত সময়ে সেচ দেয়ায় বাড়তি ফলন পেয়েছেন। অন্যদিকে সাধারণ কৃষকরা কিছুটা বিলম্বে ধান চাষ করেছেন। বীজ, সার, সেচসহ অন্যান্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে তাঁরা নির্দিষ্ট সময় ও পরিমাণ বজায় রাখতে পারেননি। এ কারণেই ফলনের ক্ষেত্রে এ ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়েছে।

এ ফলন ব্যবধান দূর করা গেলে দেশের চালের উৎপাদনে লক্ষমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। ❐

এ সময়ে ধানের রোগ দমনে করণীয়

ড. এম এ নাহার, ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন ও ড. মোঃ আব্দুল লতিফ

এ মৌসুমে আমন ধানের কয়েকটি মুখ্য রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ রোগগুলোর দমন ব্যবস্থাপনা নিচে আলোচনা করা হলো।

টুংরো রোগ (Tungro)

বাংলাদেশে প্রায় ২/৩ বছর পর পর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে টুংরো রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এবং এতে প্রচুর ফলন ঘাটতি হয়। এ রোগের বিশেষ লক্ষণ হলো—প্রাথমিক পর্যায়ে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু গাছ প্রথমে হলুদ হয়ে যায়। *নেফোটেটিক্স্ ভাইরিসেন্স* নামক সবুজ পাতাফড়িং টুংরো রোগ ছড়ায়। বীজতলাতেই প্রথমে আক্রমণ শুরু হয়। আক্রান্ত চারা রোপণ করার কিছুদিন পরই তাতে রোগের প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। আক্রান্ত চারার বা গাছের বয়স যত কম হবে ক্ষতির পরিমাণ তত বেশি হবে।

প্রতিকার : এ রোগ দমনে করণীয় -

- টুংরো রোগ কম হয় এমন জাতের ধান চাষ করা, যেমন বিআর৪, বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান৩১, ব্রি ধান৩২ ও ব্রি ধান৪৪।
- ফেনিট্রোথিয়ন ৫০ তরল, ফজালোন ৩৫ তরল, বা ম্যালাথিয়ন ৫৭ তরল হেক্টরে ১ লিটার বা কুইনালফস ২৫ তরল হেক্টরে ১.৫ লিটার প্রয়োগ করে সবুজ পাতাফড়িং দমন করা।
- আলোক-ফাঁদের সাহায্যে সবুজ পাতাফড়িং দমন করা।
- হাতজাল দিয়ে সবুজ পাতাফড়িং ধরে মেরে ফেলা।
- টুংরো আক্রান্ত জমির আশেপাশে বীজতলা করা থেকে বিরত থাকা।
- আড়ালি ঘাস ও বাওয়া ধান ধ্বংস করা।

পাতাপোড়া রোগ (Bacterial leaf blight)

চারা ও পাতায় এ রোগের তিন ধরনের লক্ষণ দেখা যায়, যেমন- কৃসেক, ফ্যাকাশে হলুদ পাতা ও পাতাপোড়া।

কৃসেক : চারা ও কুশি অবস্থায় সাধারণত কৃষেক লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগের ফলে গাছটি প্রথমে নেতিয়ে পড়ে ও আস্তে আস্তে পুরো গাছটি মারা যায়। আক্রান্ত গাছের কান্ড ছিঁড়ে চাপ দিলে দুর্গন্ধযুক্ত পুজের মতো তরল পদার্থ বের হয়।

ফ্যাকাশে হলুদ পাতা : আক্রান্ত গাছের কচি পাতা ফ্যাকাশে হলুদ হয়ে অবশেষে শুকিয়ে মারা যায়। সাধারণত দিন-রাত্রির তাপমাত্রার পার্থক্য ৮-১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হলে এ রোগ দেখা যায়।

পাতাপোড়া লক্ষণ : ধান গাছের কুশি বা তার পরবর্তী পর্যায়ের যে কোন সময় পাতাপোড়া লক্ষণ দেখা যায়। প্রথমে পাতার অগ্রভাগ বা কিনারায় নীলাভ পানিচোষা দাগ দেখা যায়। দাগগুলো আস্তে আস্তে হালকা হলুদ রং ধারণ করে। পাতার অগ্রভাগ থেকে নিচের দিকে বাড়তে থাকে। শেষের দিকে আংশিক বা সম্পূর্ণ পাতা ঝলসে যায় এবং ধূসর বা শুকনো খড়ের রং ধারণ করে।

প্রতিকার : এ রোগের প্রতিকার দুভাবে করা যায়। রোগ আক্রমণের আগে করণীয়-

- এ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ধানের জাত চাষ করা, যেমন

বোরো : বিআর২, বিআর১৪ ও বিআর১৬
আউশ : বিআর২৬ ও বিআর২৭
আমন : বিআর৪, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮, ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪১ ও ব্রি ধান৪২

আক্রান্ত মাঠে করণীয় -

- ঝড়োবৃষ্টির পর ইউরিয়া সার দেয়া যাবে না
- রোগ দেখার পর ইউরিয়া সারের উপরি-প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।
- কৃসেক আক্রান্ত জমি শুকিয়ে ৫-১০ দিন পর আবার পানি দিতে হবে।
- চারা উঠানোর সময় যেন শিকড় কম ছিঁড়ে।
- রোগাক্রান্ত জমির নাড়া ও খড় পুড়ে ফেলতে হবে।

খোলপোড়া রোগ (Sheath blight)

এ রোগে প্রাথমিক অবস্থায় পানির উপরিভাগে খোলের উপর সবুজ ধূসর দাগ পড়ে। ডিম্বাকৃতি বা বর্তুলাকার এ দাগ প্রায় ১ সেন্টিমিটার লম্বা হয় এবং এগুলো ২-৩ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে অনিয়মিত আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় দাগের মাঝখানটা ছাই বা শুকনো খড়ের রঙ ধারণ করে। কতকগুলো দাগ পরে একত্র মিশে বড় দাগের সৃষ্টি করে এবং প্রতিটি দাগ সরু বাদামি রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। তখন আক্রান্ত খোলটার উপর ছোপছোপ দাগ মনে হয়। অনুকূল ও আর্দ্র পরিবেশে আক্রান্ত গাছের পাতাও আক্রান্ত হতে পারে। সাধারণত গাছের কাইচথোড় থেকে থোড় হওয়া পর্যায় হলো এ রোগের জন্য অনুকূল সময়। রোগের প্রকোপ বেশি হলে ধান চিটা হয়ে যায়।

প্রতিকার : এ রোগ দমনে করণীয় -

- আমন মৌসুমে ধান কাটার পর আক্রান্ত জমির নাড়া জমিতেই পোড়ানো।
- সুষম মাত্রায় ইউরিয়া, টিএসপি এবং পটাশ সার ব্যবহার করা।
- ধানের জাত অনুসারে রোপণের দূরত্ব বাড়াতে-কমাতে হবে। তবে ২৫×১৫ সেন্টিমিটার বা ২০×২০ সেন্টিমিটার দূরত্বই ভাল।
- ধান গাছের সর্বোচ্চ কুশি অবস্থায় হেক্টরপ্রতি ৪০ কেজি পটাশ সার সমান দু কিস্তিতে ১৫ দিন অন্তর উপরি-প্রয়োগ করা।
- পর্যায়ক্রমে জমি শুকানো ও পানি দেয়া।
- ছত্রাকনাশক, যেমন একোনাজল ২৫০ তরল, এ্যানভিল ৫ তরল, ইভাইল্ট ২৫ তরল, ফলিকুর ই ডব্লিউ ২৫০, কনটাফ ৫ তরল বা টিল্ট ২৫০ তরল হেক্টরে ১ লিটার সমান দু কিস্তিতে অথবা ফোরাসটিন ৫০ পাউডার, এ্যাগবেন ৫০ এফ, সিনডাজিম ৫০ পাউডার, ইভাজিম ৫০ পাউডার, জেনুইন ৫০ পাউডার অথবা ভালকান ৫০ পাউডার হেক্টরে ১ কেজি বা হোমাই ৮০ পাউডার অথবা টপসিন-এম ৭০ পাউডার হেক্টরে ২.২৫ কেজি ৫০০-৮০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করা।

কাণ্ডপচা রোগ (Stem rot)

কাণ্ডপচা ছত্রাকজনিত একটি রোগ। ছত্রাক সাধারণত জমির পানির উপরের স্তর বরাবর কোন ক্ষতের মাধ্যমে গাছের ভেতর ঢুকে রোগ সৃষ্টি করে। প্রথমে গাছের বাইরের খোলে কালচে গাঢ় অনিয়মিত দাগ পড়ে এবং আস্তে আস্তে বড় হয়। পরে ছত্রাক গাছের কাণ্ডের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং তাকে দুর্বল করে দেয়। ফলে গাছ হেলে ভেঙ্গে পড়ে।

প্রতিকার : এ রোগ দমনে করণীয় -

- জমি শুকিয়ে নাড়া পোড়ানো।
- মাঝে মাঝে রোপা জমি থেকে পানি সরিয়ে জমি শুকানো।
- ঘন করে চারা না লাগানো।
- সুষম সারের ব্যবহার।
- কিছুটা সহনশীল জাতের ধান, যেমন বিআর৩ (বিপ্লব), বিআর৪ (ব্রিশাইল), বিআর৮ (আশা), বিআর১৮ (গাজী), বিআর১৬ (শাহীবালাম), বিআর২৪ (রহমত), ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৩১, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮, ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪১ ও ব্রি ধান৪২ এর চাষ করা।
- হেক্টরে ২.২৫ কেজি হোমাই ৮০ পাউডার বা টপসিন-এম ৭০ পাউডার ৫০০-৮০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ছিটিয়ে দেয়া।

বাকানি বা গোড়াপচা রোগ (Bakanae or foot rot)

বাকানি বা গোড়াপচা একটি ছত্রাকজনিত রোগ। মূলত ধানের বীজের মাধ্যমে এ রোগটি ছড়ায়। এ রোগের লক্ষণ হলো, আক্রান্ত চারা স্বাভাবিক চারার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ লম্বা হয় এবং আক্রান্ত চারার পাতা হলদে সবুজ হয়। আক্রান্ত চারা বেশি দিন বাঁচে না। এ ছাড়াও গাছখাটো হওয়া, গোড়া পচা এবং চারার মৃত্যু

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

এ সময়ে ধানের রোগ

৩-এর পাতার পর

এ রোগের আনুষঙ্গিক লক্ষণ। আক্রান্ত গাছের কুশি লিকলিকে হয়। এদের ফ্যাকাশে সবুজ পাতা অন্যান্য গাছের উপর দিয়ে দেখা যায় এবং নিচের দিকের গিঁটে অস্থানিক শিকড়ও দেখা যেতে পারে। আক্রান্ত গাছ যদি কোন রকমে বেঁচেও যায় তবে সেগুলোর ছড়ায় চিটা ধান হয়।

প্রতিকার : এ রোগ দমনে করণীয় -

- হোমাই ৮০ পাউডার ৩:১০০০ দ্রবণে বীজ এক রাত ভিজিয়ে রেখে অথবা প্রতি কেজি বীজ ৩ গ্রাম হোমাই দিয়ে শোধন করা।
- বীজতলা ভিজা রাখা এবং একই জমি বীজতলার জন্য ব্যবহার না করা।
- আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলা।
- সুষম সারের ব্যবহার।
- কিছুটা প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ধানের জাত, যেমন বিআর৩ (বিপ্লব) বিআর৮ (আশা), বিআর৯ (সুফলা), বিআর১১ (মুক্তা), বিআর১৪ (গাজী), ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৩১, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৫, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮, ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪২ ও ব্রি ধান৪৩ এর চাষ করা।

কৃমিজনিত উফরা রোগ (Ufra)

বিশেষত জলী আমন ও জোয়ার ভাটা অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে কৃমির কারণে ধানের এ রোগ হয়ে থাকে। এ কৃমি এত ছোট যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে এদেরকে দেখা যায় না। মাটি বাহিত এ কৃমি গাছের উপরের অংশ আক্রমণ করে। খোলের ভেতর আবদ্ধ পাতা এবং বর্ধিষ্ণু নতুন শীষের কচি অংশে এরা পরজীবী হিসেবে বেঁচে থাকে। যে পাতা সবে মাত্র বের হচ্ছে, সে পাতার গোড়ার দিকে প্রথমে সাদা ছিটেফোটা দাগ পড়ে। আক্রমণের প্রবণতা বেশি হলে কচিপাতা বাদামি রংয়ের হয় এবং সম্পূর্ণ পাতা শুকিয়ে যায়। থোর বের হওয়ার সময় মুচড়ে যায় এবং ধান চিটা হয়। কোন কোন সময় থোর বা ছড়া মোটেই বের হয় না। এ রোগের জীবাণু কৃমি সেচের পানি বা জলস্রোতের সাথে এক জমি থেকে অন্য জমিতে যায়।

প্রতিকার : এ রোগ দমনে করণীয় -

- মৌসুম শেষে চাষ দিয়ে জমি ও নাড়া শুকানো।
- নাড়া জমিতেই পুড়িয়ে ফেলা।
- জলি আমন ধান দেরিতে বুনলে এ রোগ কম হয়।
- ধানের সাথে শস্যক্রমে অন্য ফসল করা।
- ফুড়াডান ৫জি বা কিউরেটার ৫জি এর যে কোন একটি হেক্টরে ২০কেজি হিসেবে চারা রোপণ করার আগে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া। রোগের মাত্রা বেশি হলে ৬-৮ সপ্তাহ পর আবার একই মাত্রায় উপরের ঔষধ প্রয়োগ করা। ❐

ধান গবেষণায় ৩৫ বছরের সাফল্য

গত ১ অক্টোবর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর ৩৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। ১৯৭০ সালে ৭৬.৮২ হেক্টর জমির উপর ঢাকা শহর থেকে ৩৬ কিলোমিটার উত্তরে গাজীপুরে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্রি স্থাপন করা হয়। ষাট দশকের মাঝামাঝি আমাদের দেশে সবুজ বিপ্লব সূচিত হলেও ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এর প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। গত ৩৫ বছরে ব্রি উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধানের জাত ও উন্নত চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও জাতীয় অগ্রগতিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। ব্রি-র সাফল্যের উল্লেখ্যযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে -

- একটি হাইব্রিডসহ ৪৫টি উফশী ধানের জাত উদ্ভাবন। এদের ফলন প্রচলিত জাতের চেয়ে ২-৩ গুণ বেশি।
- মাটি, পানি, সার ব্যবস্থাপনা ও ধানের চাষাবাদ পদ্ধতির ৫০টির বেশি উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- ৩১টি লাভজনক ধান-ভিত্তিক শস্যক্রম উদ্ভাবন।
- ১৯টি কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।
- ধানের ৩১টি রোগ ও ১৭৫টি ক্ষতিকর পোকা সনাক্তকরণ এবং বালাই ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন।
- বিশ হাজারেরও বেশি কর্মকর্তা ও কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১৮১টি বই-পত্র প্রকাশ।
- দেশে ও বিদেশের ৮ হাজার ধানের জার্মপ্লাজম ব্রি জিন ব্যাংকে সংরক্ষণ।
- ২০০৪-২০০৫ সালে আধুনিক ধানের জাত দেশের শতকরা প্রায় ৭৪ ভাগ জমিতে চাষ করা হয়েছে এবং এ থেকে পাওয়া গিয়েছে দেশের মোট চাল উৎপাদনের প্রায় ৮৭ ভাগ।
- ১৯৭০-১৯৭১ সালে জনসংখ্যা ছিল ৭১.২১ মিলিয়ন। তখন চালের উৎপাদন ছিল ১০.৯৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ২০০৪-২০০৫ সালে প্রায় ১৪০ মিলিয়ন মানুষের জন্য চাল উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬.৮৭ মিলিয়ন মেট্রিক টনে। সরকারের সুষ্ঠু পরিকল্পনা, উফশী ধানের জাতসহ উন্নত চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ-পর্যায়ে সম্প্রসারণ এবং চাষীভাইদের অক্লান্ত মেহনতের ফলেই এ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।
- ধান গবেষণা ও সম্প্রসারণে প্রতি এক টাকা বিনিয়োগ থেকে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি ও সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে ৩৮ টাকা মুনাফা অর্জন।
- পৃথিবীর ১৯টি দেশে ব্রি উদ্ভাবিত ২০টি জাতের ধান চাষ করা হচ্ছে।
- বিজ্ঞান ও কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনবার রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ও তিনবার স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারসহ বিভিন্ন সময়ে ব্রি ও ব্রি-র কয়েকজন বিজ্ঞানীর ১২টি পুরস্কার লাভ। ❐

মোঃ সাজ্জাদুর রহমান

মোঃ রুহুল আমিন সরকার

ইবনে সৈয়দ মোঃ হারুনুর রশীদ

বার্ডের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

ব্রি-র তিন জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার কৃতিত্ব

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) তিন জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর (বার্ড) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছেন।

এদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ সাজ্জাদুর রহমান, দ্বিতীয় হয়েছেন কৃষিতত্ত্ব বিভাগের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ রুহুল আমিন সরকার এবং তৃতীয় হয়েছেন কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ইবনে সৈয়দ মোঃ হারুনুর রশীদ।

দেশের বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ৪০ জন বিজ্ঞানী ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ জুন ২০০৫ বার্ড আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নেন। ❐

ধান উৎপাদনে প্রধান তিনটি সারের ভূমিকা

ড. আব্দুল লতিফ শাহ ও ড. আব্দুল মজিদ মিয়া

ধান গাছ প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান ও পানি মাটি থেকে গ্রহণ করে। গাছ তার বাড়-বাড়তি ও ফলনের জন্য তিনটি মুখ্য উপাদান মাটি থেকে বেশি পরিমাণ গ্রহণ করে। ফলে এদের সহজ প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য মাটিতে বিভিন্ন পরিমাণে এ তিনটি সার ব্যবহার করা হয়। এগুলো হচ্ছে, নাইট্রোজেন বা ইউরিয়া, ফসফরাস বা টিএসপি এবং পটাশিয়াম বা পটাশ সার। এ ছাড়াও অনেক সময় মাটিতে গন্ধক ও দস্তার অভাব দেখা গেলে সার দুটি ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘ মেয়াদি পরীক্ষায় দেখা গেছে, বোরো ও আমন মৌসুমে প্রধান তিনটি সারই ফলন বৃদ্ধি করে (চিত্র ১)।

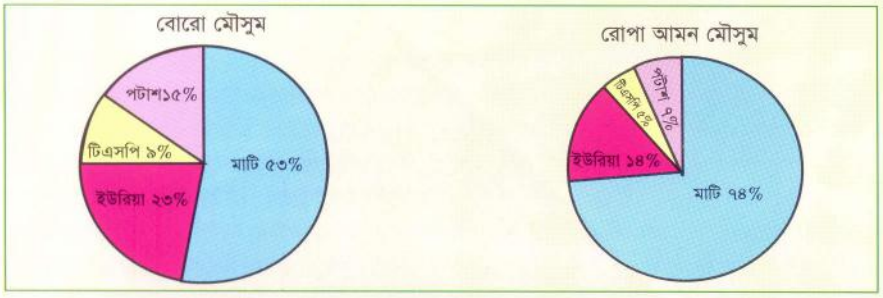

চিত্র ১। মৌসুম অনুযায়ী ধানের ফলন বৃদ্ধিতে মাটি ও সারের ভূমিকা।

বোরো মৌসুমে ইউরিয়া সার শতকরা ২৩ ও আমন মৌসুমে ১৪ ভাগ ফলন বৃদ্ধি করে। আর টিএসপি বোরোতে শতকরা ৯ ও আমনে ৫ ভাগ এবং এমপি সার যথাক্রমে ১৫ ও ৭ ভাগ ফলন বৃদ্ধি করে। তাই ভাল ফলন পেতে হলে প্রধান তিনটি সার সব সময় ব্যবহার করা প্রয়োজন। এ তিনটি সার একত্রে সঠিক মাত্রায় ব্যবহারকে সুষম সার ব্যবস্থাপনা বলা হয়। সুষম সার ব্যবহার করলে সবচে বেশি ফলন পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অপর দিকে এ তিন সারের যে কোন একটি ব্যবহার না করলে ফলন কমে যেতে পারে। তবে অনেক সময় গন্ধক বা দস্তার অভাবগ্রস্ত মাটিতে এ সকল সারের একটি সমানুপাতিক ব্যবহারকে সুষম সার ব্যবস্থাপনা বলা হয়।

ভাল ফসলের জন্য সুষম সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। সারের কার্যকারিতার লক্ষ্যে কোন সার কখন ও কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে তা জানা দরকার। ইউরিয়া সার ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য গাছের কুশির সংখ্যা বাড়ানো, কারণ সাধারণত প্রথম দিকের কুশিতেই ছড়া ভাল হয়। প্রথম থেকে চারা ও কুশিকে সবল রাখার জন্য এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া ও অন্যান্য সার, যেমন টিএসপি, পটাশ এবং প্রয়োজনে গন্ধক ও দস্তা সার মাত্রানুযায়ী জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। টিএসপি সার গাছের শেকড় বৃদ্ধি ঘটায় এবং পটাশ গাছকে সবল ও টার্গর প্রেসার বজায় রাখতে সাহায্য করে। তবে বেলে মাটিতে পটাশ সার দু'কিস্তিতে দেওয়া ভাল। অবশিষ্ট ইউরিয়া সমান দু'কিস্তিতে উপরি-প্রয়োগ করতে হয়। প্রথম উপরি-প্রয়োগ করতে হয় চারা লাগানোর তৃতীয় সপ্তাহে যখন গজানো কুশিগুলো বাড়-বাড়তির দিকে থাকে। নতুন নতুন কুশি জন্মানোর সময়কে বিবেচনা করে এটা করতে হয়। আর দ্বিতীয় উপরি-প্রয়োগ করতে হয় সর্বোচ্চ কুশি উৎপাদন বা কাইচথোড় আসার আগে যেন এ ইউরিয়া সার ধানের সংখ্যা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় ইউরিয়া সার সমানভাবে ছিটানোর পর হাতড়িয়ে বা নিড়ানি দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারলে ভাল ফলন আশা করা যায়। মাটির সাথে সার মিশানোর পর যেন ৩/৪ দিন মাটিতে পর্যাপ্ত রস বা কিছু পানি থাকে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে শুকনো মাটি কিংবা জমিতে খুব বেশি পানি থাকলে অথবা ধান গাছের পাতায় পানি জমে থাকলে ইউরিয়া সার উপরি-প্রয়োগ করা ঠিক নয়।

ইউরিয়া সার প্রয়োগ করার পরেও ধানগাছ যদি হলদে থাকে এবং বৃদ্ধি কম হয় তাহলে গন্ধকের অভাব হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ হিসেবে জমি থেকে পানি সরিয়ে দিয়ে হেক্টরপ্রতি ৬০ কেজি বা বিঘাপ্রতি ৮ কেজি জিপসাম সার উপরি-প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে। তবে উপরি-প্রয়োগের সময় জিপসাম সার মাটি কিংবা ছাইয়ের সাথে অথবা ইউরিয়া উপরি-প্রয়োগের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা ভাল।

যদি ধানগাছ মাঝেমধ্যে খাটো হয় বা বসে যায় এবং পুরাতন পাতায় মরচে পড়া বাদামি রঙ থেকে কমলা রঙ ধারণ করে এবং ধানের কুশি কম থাকে তখন দস্তার অভাব হয়েছে বলে ধরে নেয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে। তারপর হেক্টরপ্রতি ১০ কেজি বা বিঘাপ্রতি ১ কেজি ৩৫০ গ্রাম দস্তা সার উপরি-প্রয়োগ করেত হবে। ❐

বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে পামরী পোকার নতুন আক্রমণ

ড. মাইনুল হক, মোঃ ফজলে রাব্বী ও মোঃ নাজমুল বারী

পামরী ধানের একটি প্রধান ক্ষতিকর পোকা। এ পোকার আক্রমণে শতকরা ২০-৬০ ভাগ ফলনের ক্ষতি হতে পারে। তবে মৌসুম ও অঞ্চলভেদে পামরী পোকার আক্রমণের তারতম্য চোখে পড়ে। বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় ১৯০৫ সালে প্রথম পামরী পোকার আক্রমণ দেখা দেয়। পরে বিভিন্ন সময়ে ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, যশোর, নোয়াখালী, ফেণী, খুলনা এবং অন্যান্য জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে পামরীর আক্রমণ লক্ষ করা গেছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলকে পামরী পোকার আক্রমণ-প্রবণ এলাকা হিসাবে সনাক্ত করা হয়।

সিলেট অঞ্চলে পামরী পোকার ব্যাপক আক্রমণের প্রেক্ষিতে ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যৌথ জরিপে বৃহত্তর সিলেট জেলাকে পামরী পোকার আক্রমণ-প্রবণ এলাকা হিসাবে সনাক্ত করা হয়। অথচ একই সময় বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে এ পোকার তেমন কোন আক্রমণ দেখা যায়নি।

সাধারণত বোরো মৌসুমে পামরী পোকার সংখ্যা খুব কম থাকে। তবে আউশ মৌসুমে এর আক্রমণ ক্রমান্বয়ে বেড়ে আমন মৌসুমে মারাত্মক রূপ নেয়। দেখা গেছে, আমন ধান কাটার পর সিলেটের নিচু জলাবদ্ধ এলাকায় পামরী পোকা নরদুলা/নল ঘাস (*Hymenachne acutigluma*), শ্যামা (*Echinochloa* sp) জংলিদল (*Hygroryza aristata*) প্রভৃতি আগাছার পাতার উপর আশ্রয় নেয় এবং বংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। পরে ওসব আগাছা থেকে বোরো মৌসুমের বীজতলায় প্রাথমিক আক্রমণ শুরু হয়। বোরো মৌসুমে তাপমাত্রা কম থাকায় পামরীর বংশ বৃদ্ধির হার খুব কম থাকে। কিন্তু আউশ মৌসুমে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও মৌসুমি বৃষ্টিপাতের সূচনায় এদের বংশ বৃদ্ধি দ্রুত হয়।

২০০৫ সালে সিলেটের বিভিন্ন জায়গায় আউশ ফসলে পামরীর ব্যাপক আক্রমণ শুরু হয়েছে। এ পোকা এখান থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার আমন ফসলে ব্যাপক আক্রমণ করতে পারে। কাজেই আমন ধানে পামরীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হলে জরুরি ভিত্তিতে দমন ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

কীড়া ও পূর্ণবয়স্ক উভয় অবস্থায় পামরী পোকা ধানের ক্ষতি করে। কীড়া পাতার দু'পর্দার মাঝে সুরঙ্গ করে খায় আর পূর্ণবয়স্ক

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

প্রশিক্ষণ সংবাদ

● ১৬ এপ্রিল থেকে ১৫ মে এবং ২৫ মে থেকে ২২ জুন ২০০৫ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যথাক্রমে ২২ ও ২৩ জন কর্মকর্তা (এএও, এইও এবং এটিআই/এআইটি প্রশিক্ষক) দুটি এক মাসব্যাপী ধান উৎপাদন প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

● মে ও জুন মাসে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)-এর উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের জন্য দুটি সপ্তাহব্যাপী এবং একটি তিন দিনব্যাপী বিশেষ ধান উৎপাদন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়।

● ২৮ জুন থেকে ৩০ জুন কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগের অর্থায়নে Breeder Seed Production শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। এতে ব্রি-র ৩০ জন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক সহকারী, খামার ব্যবস্থাপক এবং সহকারী খামার ব্যবস্থাপক অংশ নেন।

● ১০-১২ জুলাই ২০০৫ ডিএই-র এসপিএফএস প্রকল্পের অর্থায়নে কৃষি যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর তিন দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। এতে রংপুর, কুড়িগ্রাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, যশোর, খুলনা, পিরোজপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, বান্দরবান, শেরপুর, ফরিদপুর, রাজশাহী, নেত্রকোণা এবং ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে ৩৪ জন কৃষক এবং কৃষিযন্ত্র ব্যবহারকারী অংশ নেন।

● নব নিযুক্ত উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের জন্য পরিচালিত সপ্তাহব্যাপী ধান উৎপাদন প্রশিক্ষণের ৪র্থ ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী এম কে আনোয়ার, এম পি। তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে নতুন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদেরকে উৎসাহিত করতে এবং ব্রি-কে এ প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ❐

ভূ-গর্ভের পানি দিয়ে উপকূলীয় এলাকায় শস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা

মোঃ মাহবুবুল আলম, মোঃ মনিরুজ্জামান ও ড. এম এ সাত্তার

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ৮.৫ লক্ষ হেক্টর জমি লবণাক্ততা সমস্যায় আক্রান্ত। দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় এলাকায় রবি ও প্রাক-খরিপ মৌসুমে অত্যধিক লবণাক্ততার কারণে ভূ-উপরস্থ (নদী ও খাল) এবং ভূ-গর্ভস্থ (১০-৬০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত) পানি ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় না। এ সময়ে এ সব এলাকার পানির লবণাক্ততা সর্বোচ্চ প্রায় ২৫ ডিএস/মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ফলে তা ধানসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদনে আর ব্যবহার উপযোগী থাকে না। অথচ রবি মৌসুমের শেষ ভাগে ও খরিপ মৌসুমের শুরুতে সামান্য সেচ দিতে পারলে এ অঞ্চলে একটি বা দুটি অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হতো।

উপকূলীয় এলাকায় ভূ-উপরস্থ পানি সীমিত এবং সেচের জন্য তা উৎস হতে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া দুরূহ। উপকূলীয় এলাকায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ উপযোগী ভূ-গর্ভস্থ পানি অনুসন্ধানে ব্রি-র সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ সোনাগাজী উপজেলা ও পাশের এলাকায় একটি গবেষণা কর্মসূচি চালাচ্ছে। এতে বিভিন্ন স্থানে ভূ-গর্ভের বিভিন্ন স্তরে মাটির ধরন ও পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে, উপকূলীয় এলাকায় ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৮০-২৫০ মিটার গভীরতায় সেচ উপযোগী পানির কয়েকটি স্তর আছে যা অপ্রবেশ্য কাদামাটির স্তর দিয়ে উপরের লবণাক্ত পানির স্তর থেকে পৃথক রয়েছে। এ পানির লবণাক্ততা সারা বছর ০.৫ ডিএস/মিটার এর নিচে থাকে। অন্যান্য ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ বিবেচনায়ও এ পানি ফসল উৎপাদনে ব্যবহার উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে সীমিত উত্তোলনের মাধ্যমে এ পানি দিয়ে ধান ও বিভিন্ন রবি শস্য উৎপাদন করা হয়েছে। তবে এ পানির নিরাপদ উত্তোলনের পরিমাণ নির্ণয় এখনও গবেষণা পর্যায়ে রয়েছে। রবি মৌসুমের শেষ ভাগে এই পানি দিয়ে এক বা দুটি সেচের মাধ্যমে সরিষা, মরিচ, সূর্যমুখী, সয়াবিন, টমেটো ইত্যাদি ফসল উৎপাদন করা যেতে পারে।

খরিপ-১ মৌসুমে ঢেঁড়স আবাদেও এ পানি ব্যবহার করা যেতে পারে। জমিতে পর্যাপ্ত রসের অভাব বা বপন পরবর্তী খরার কারণে অনেক সময় বৃষ্টি-নির্ভর বোনা আউশ ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভূ-গর্ভস্থ এ পানি দিয়ে বপন পূর্ববর্তী বা বপন পরবর্তী সময়ে সেচ দিয়ে সময়মতো আউশ ধান আবাদ করা যেতে পারে। ফলে শুধু আউশ ধানের নয়, সময়মতো লাগানোর মাধ্যমে আমন ধানেরও ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ❐

ব্রি-র নতুন অবদান
বাংলাদেশ রাইস নলেজ ব্যাংক

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) সম্প্রতি ইন্টারনেট ওয়েবসাইটে রাইস নলেজ ব্যাংক (বিআরকেবি) নতুনরূপে উপস্থাপন করেছে। এ ওয়েবসাইটের ঠিকানা-

www.knowledgebank-brri.org

নলেজ ব্যাংক হলো কোন বিষয়-ভিত্তিক জ্ঞান ও তথ্যের সার-সংক্ষেপ একত্রে সমন্বিতরূপে উপস্থাপনের একটি পদ্ধতি। বাংলাদেশ রাইস নলেজ ব্যাংকে ধান উৎপাদন বিষয়ে প্রাসঙ্গিক যাবতীয় তথ্য সহজবোধ্য বাংলা ও ইংরেজিতে তুলে ধরা হচ্ছে। ❐

ভিয়েতনামের বিজ্ঞানীর ইনস্টিটিউট পরিদর্শন

ভিয়েতনামের কূলং ডেল্টা রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. বুই চি বূ ২৭ জুলাই ২০০৫ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) পরিদর্শন করেন। এ উপলক্ষে ব্রি-র ভিআইপি কনফারেন্স রুমে আয়োজিত মত বিনিময় সভায় ব্রি-র মহাপরিচালক ড. এম মহিউল হক ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম ও সাফল্যের বিবরণ তুলে ধরেন। সভায় ব্রি-র পরিচালক (গবেষণা) ড. এম এ বাকী, পরিচালক (প্রশাসন) ড. নাজিরা কোরাইশী কামাল এবং বিভাগীয় প্রধানসহ উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ড. বূ ভিয়েতনামে আধুনিক ধান চাষের সাফল্য, সম্ভাবনা ও সমস্যার উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। ব্রি-র উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রধান ড. এম এ ছালাম এ ইনস্টিটিউট ধানের জাত উদ্ভাবন কার্যক্রমের বিবরণ দেন। সভায় বক্তাগণ উভয় দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা বিশেষ করে সরু চাল ও অতি আগাম ধান এবং সেচ ব্যবস্থাপনায় ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উপর জোর দেন। আলোচনা শেষে ড. বূ রোপা আউশ এবং গভীর পানিতে ধান গবেষণার প্লটগুলো ঘুরে দেখেন। তিনি পরে লবণাক্ত এলাকায় ভিয়েতনামের ধানের জাত চাষের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শনে খুলনা যান। ❐

ড. এম এ বাকী

৮ম পৃষ্ঠার পর

দেশের ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জার্নাল ও প্রসিডিংসে তার ৬৪টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ত্রিশ বছরের কর্মজীবনে তিনি কারিগরি বিশেষজ্ঞ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও ভারত সফর করেছেন। ❐

ড. নাজিরা কোরাইশী কামাল

৮ম পৃষ্ঠার পর

ও ধানের পোকামাকড়ের জৈব নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উদ্ভাবন কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনে অবদান রেখেছেন। ১৯৪৯ সালে তিনি ময়মনসিংহ শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণি বিদ্যা বিভাগ থেকে ১৯৭০ সালে এমএসসি এবং ফিলিপাইনের গ্রেগরিও আরানেটা ইউনিভারসিটি ফাউণ্ডেশন থেকে ১৯৮১ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

বাংলাদেশের ধান ক্ষেতের মাকড়সা, এবং পাকিস্তান, ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের ধান-গম শস্য-বিন্যাসের মাজরা পোকার উপর দুটি বইসহ দেশ-বিদেশের জার্নাল ও প্রসিডিংসে তার ৬৫টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি ভারত, থাইল্যান্ড, হংকং, সিঙ্গাপুর, দুবাই, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও মালয়েশিয়া সফর করেছেন। ❐

ড্রাম সিডার দিয়ে

৮ম পৃষ্ঠার পর

কর্মশালায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মুখ্য সচিব ড. সুখ বিলাস বর্মার নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল অংশ নেন। ব্রি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্রি-র মহাপরিচালক ড. এম মহিউল হক সভাপতিত্ব করেন এবং স্বাগত ভাষণ দেন।

ইরি-র ফার্মিং সিস্টেমস বিশেষজ্ঞ ড. এম জয়নুল আবেদিন অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ডিএই মহাপরিচালক ইব্রাহিম খলিল, ইরি-র সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. মাহবুব হোসেন, ব্রি-র ফলিত গবেষণা বিভাগের প্রধান এবং ইফাদ প্রজেক্ট লিডার ড. এম মোশাররফ হোসেন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

এ কর্মশালায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২২৫জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ❐

রোপা ধানে কার্যকর আগাছা দমন পদ্ধতি

ড. গাজী জসিম উদ্দিন আহমেদ ও মোঃ খায়রুল আলম ভূঁইয়া

ধানের আগাছা দমনে চাষীভাইদের অনেক অর্থ ও শ্রম ব্যয় করতে হয়। সনাতন পদ্ধতিতে ভালভাবে আগাছা দমন করা যায় না। ফলে ফসলের ক্ষতি হয়।

হাত নিড়ানি পদ্ধতিতে আগাছা দমনে রোপা ধানে সাধারণত শতকরা ১০-১৫ ভাগ ফলন কম হয়। আগাছা দমনের খরচ হয় বিঘাপ্রতি ৫০০-১০০০ টাকা। এ খরচ এবং ফসলের ক্ষতির জন্য ধানের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। কিন্তু সে অনুপাতে ধানের মূল্য চাষীভাইয়েরা পান না। এ পরিপ্রেক্ষিতে কম খরচে আগাছা দমনের কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য ব্রি-র কৃষিতত্ত্ব বিভাগ চাষীভাইদের সহযোগিতায় কুমিল্লা জেলায় গবেষণা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

গবেষণায় দেখা যায়, আগাছার উৎপাতে চাষীভাইয়েরা আমন মৌসুমে হেক্টরে ৩০০-৫০০ কেজি ও বোরো মৌসুমে হেক্টরে ৩০০-৭০০ কেজি ফলন কম পান। শতকরা ১০ ভাগ চাষী হেক্টরে ৫০০ কেজির বেশি ধানের ফলন কম পান। এ ছাড়া তাদের আগাছা দমন পদ্ধতিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, বোরো মৌসুমে এবং আমন মৌসুমে একবার আগাছানাশক প্রয়োগের পরে প্রায়শই আগাছা জন্মে না। তবে পরে কিছু জন্মানো আগাছা সামান্য হাত নিড়ানির মাধ্যমে দমন করা যায়। রিফিট-৫০০ ইসি, ম্যাচেটি৫জি, এইমক্লোর৫জি, রনস্টার ২৫ ইসি ও আরগোল্ড ১০ইসি সবচেয়ে কার্যকর আগাছানাশক হিসাবে দেখা গেছে। এর সাথে সামান্য হাত নিড়ানির প্রয়োজন হতে পারে।

ধান লাগানোর ৩-৫ দিনের মধ্যে তরল আগাছানাশক রিফিট ও আরগোল্ড বিঘাপ্রতি ১৩৫ মিলিলিটার ও ১০০ মিলিলিটার সেচন যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে প্রয়োগ করতে হয়। প্রয়োগ করার সময় বোতলের গায়ে লেখা ব্যবহার পদ্ধতি ভাল করে পড়ে নিতে হবে। পরিমিত ঔষধ পানির সাথে মিশিয়ে পুরো ক্ষেতে সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োগের সময় অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যাতে আগাছানাশক মুখ, চোখ ও কান দিয়ে শরীরে প্রবেশ না করে এবং গায়ে লাগলে ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে।

দানাদার আগাছানাশক ম্যাচেটি ৫জি বা এইমক্লোর ৫জি প্রতি বিঘায় ৩.৩ কেজি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। হাতে পলিথিন মুড়িয়ে দানাদার আগাছানাশক সমানভাবে ক্ষেতে ছিটিয়ে দিতে হবে। আগাছানাশক প্রয়োগের সময় ক্ষেতে ছিপছিপে পানি রাখতে হবে এবং ক্ষেত যাতে শুকিয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সাত দিন পর পানির উচ্চতা কিছুটা বাড়ালেও আর অসুবিধা হবে না। আগাছানাশক ব্যবহারের পরও জমিতে দু-এক জাতের আগাছা, যেমন দূর্বা, গৈচা, হেলেঞ্চা জন্মাতে পারে। ওগুলো হাত দিয়ে তুলে ফেলতে হবে।

আগাছানাশক ব্যবহার করতে আগ্রহী না হলে ব্রি উইডার ব্যবহার করা যায়। এর মূল্য মাত্র ২২০ টাকা। এর সাহায্যে প্রতি ঘন্টায় ১০ শতাংশ জমির আগাছা দমন করা যায়। ব্রি উইডার ব্যবহার করা হলে ধান রোপণের ১৫-২০ দিন পর একবার ও ৩০-৩৫ দিন পর একবার উইডার ধান ক্ষেতে ব্যবহার করতে হবে। এটি ব্যবহার করতে হলে ধান অবশ্যই সারিতে রোপণ করতে হবে এবং গোছা থেকে গোছার দূরত্ব ২০×২০ সেন্টিমিটার হতে হবে। গোছার কাছে জন্মানো আগাছা হাত দিয়ে তুলে ফেলতে হবে। ব্রি উইডার ব্যবহার করলে বিঘাপ্রতি ৩০০-৪০০ টাকা খরচ হয়। অন্যদিকে আগাছানাশক ব্যবহার করলে বিঘাপ্রতি ২০০-২৫০ টাকা খরচ হয়। আগাছানাশক ও ব্রি-উইডার দিয়ে চাষী-ভাইয়েরা রোপা আউশ, রোপা আমন ও বোরো ধানের আগাছা কম খরচে দমন করতে পারবেন। ফলে তাদের ফসল উৎপাদনের খরচ কমে যাবে। ভালভাবে আগাছা দমনের জন্য উৎপাদনও বাড়বে।

সর্তকর্তা : আগাছানাশক ব্যবহারের পর এর প্যাকেট ও বোতল মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। সেচন যন্ত্র পুকুরে না ধুয়ে শুকনো জায়গায় পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা প্রয়োজন। আগাছানাশক শিশুদের নাগালের বাইরে রাখা দরকার। ❐

বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে পামরী

৫ম পৃষ্ঠার পর

পোকা পাতার সবুজ অংশ কুরে কুরে খায়। এদের দমনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

- আউশ বা আমন ধানের বীজতলায় হাত জাল অথবা গামছা দিয়ে পূর্ণবয়স্ক পামরী ধরে মেরে ফেলতে হবে।
- পোকার ডিম ও কীড়াসহ পাতার গোড়ার ৩-৪ সেন্টিমিটার উপর থেকে কেটে পাতাগুলো নষ্ট করে ফেললে শতকরা ৭৫-৯২ ভাগ কীড়া ধ্বংস করা যায়। তবে কাইচথোড় আসার সময় পাতা কাটলে ফলনের ক্ষতি হতে পারে।
- ক্ষেতে শতকরা ৩৫ ভাগ পাতা আক্রান্ত হলে অথবা প্রতি গোছায় পাঁচটি পূর্ণবয়স্ক পোকা অথবা প্রতি কুশিতে পাঁচটি বাচ্চা পোকা থাকলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করুন। ❐

ড. এম এ বাকী ব্রি-র পরিচালক (গবেষণা)

দেশের বিশিষ্ট কৃষি প্রকৌশলী ড. এম এ বাকী ৮ জুন ২০০৫ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। এর আগে তিনি ব্রি-র পরিচালক (প্রশাসন) এর চলতি দায়িত্ব পালন করছিলেন।

তিনি দেশের উপযোগী ১৯টি লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও জনপ্রিয়করণে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর উদ্ভাবিত ব্রি ডায়াফ্রাম পাম্পের জন্য ব্রি ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেছে।

১৯৫০ সালে ঠাকুরগাঁও-এর পীরগঞ্জ উপজেলার কিসমত সৈয়দপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে ১৯৭২ সালে কৃষি প্রকৌশলে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ইউনিভারসিটি অব ফিলিপাইনস থেকে ১৯৮১ সালে কৃষি প্রকৌশলে এমএস এবং সেন্ট্রাল লুজন স্টেট ইউনিভার্সিটি, মুনজ, ফিলিপাইন থেকে ১৯৯০ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব গ্রিনিচের অধীনে ন্যাচারাল রিসোর্স ইনস্টিটিউটে ২০০৩ সালে পোস্ট ডক্টোরাল রিসার্চ ফেলোশিপ লাভ করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে প্লাস্টিক ড্রাম সিডার দিয়ে ধান চাষ বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন কৃষি মন্ত্রী এম কে আনোয়ার, এমপি।

ড্রাম সিডার দিয়ে ধান চাষে হেক্টরে বাড়তি লাভ ৯ হাজার টাকা

ড্রাম সিডার দিয়ে সরাসরি বোনা প্রদ্ধতিতে ধান চাষ বেশ লাভজনক। এ পদ্ধতি শ্রম সাশ্রয়ী; এর উৎপাদন খরচ কম এবং এতে ফলন বেশি হয়। সনাতন রোপণ পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতির ধান চাষে গড়ে হেক্টরে ৯ হাজার টাকা বাড়তি লাভ হয়। ধান চাষ বিষয়ক তিন দিনের এক কর্মশালায় এ তথ্য জানানো হয়।

কৃষি মন্ত্রী এম কে আনোয়ার গত ২১ জুন গাজীপুরে ব্রি মিলনায়তনে তিন দিনের এ কর্মশালা উদ্বোধন করেন। কাদাময় জমিতে প্লাস্টিক ড্রাম সিডার দিয়ে সরাসরি বপন পদ্ধতিতে ধান চাষ শীর্ষক এ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি প্রতিমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য আলী ইমাম মজুমদার।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ড. নাজিরা কোরাইশী কামাল ব্রি-র পরিচালক (প্রশাসন)

দেশের বিশিষ্ট কীট-তত্ত্ববিদ ড. নাজিরা কোরাইশী কামাল ৮ জুন ২০০৫ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর পরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

১৯৭৪ সালে ড. কোরাইশী ব্রি-তে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করে গত ৩১ বছর যাবৎ ব্রি-র বিভিন্ন পদে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। ধানের পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি, বিশেষ করে সমন্বিত পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা বা আইপিএম, ইঁদুর দমন ব্যবস্থাপনা

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

উপদেষ্টামণ্ডলী
ড. এম মহিউল হক
ড. এম এ বাকী
ড. নাজিরা কোরাইশী কামাল
ড. বি এ এ মুস্তাফি

সম্পাদনায়
মনোরঞ্জন মণ্ডল
মোঃ আবুল কাসেম

ছবি
মোঃ হারুন অর রশীদ

বুক পোস্ট

স্ট্যাম্প

মুদ্রিত কাগজ

প্রকাশনা ও জনসংযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। ফোন: ৮৮-০২-৯২৫৭৪০১-৫; ফ্যাক্স: ৮৮-০২- ৯২৬২৭৩৪
ই-মেইল : brrihq@bdonline.com; ওয়েবসাইট: www.brri.org.bd। মুদ্রণে : রব আর্ট প্রেস, আফাজ ভবন, মসজিদ রোড, জয়দেবপুর, গাজীপুর। ফোন: ৯২৫২৪০৮